ভূমিকা — নারীশিক্ষা : ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

সুপর্ণা গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৪-২৫-২৬ জানুয়ারি ২০০০ সাল, কলকাতার বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে। উনবিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেথুন কলেজের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। সেই কারণেই এই সম্মেলনে আলোচনার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ। এই উপলক্ষে একটি বার্ষিক স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়। যার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'ইতিহাসের আলোকে বাংলার নারীশিক্ষা'। স্মরণিকা ছাড়াও এই সম্মেলনের বাড়তি আকর্ষণ ছিল 'ইতিহাসের আলোকে একবিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষা' শীর্ষক এক আলোচনাসভা। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে, সংসদ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে, এবারের সম্মেলনের কেন্দ্রীয়ের বিষয় গুরুত্ব তুলে ধরার এ ছিল এক হার্দিক প্রয়াস। এই আলোচনা সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলিকে ও স্মরণিকায় প্রকাশিত রচনাগুলিকে সংকলিত করা জরুরি হয়ে ওঠে সেই কারণেই। নারী শিক্ষার প্রসার ও প্রভাব সম্পর্কে সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা ও গবেষণায় যে পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে তারই একটি সম্পূর্ণ না হলেও, আংশিক চিত্র তুলে ধরার তাগিদেই এই সম্পাদকীয় নিবন্ধের অবতারণা। এই সংকলনের আরও একটি উদ্দেশ্য বেথুন কলেজে সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে নারীশিক্ষা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল প্রকাশ করা।

এই গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলিতে নারীশিক্ষার নানান দিক আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন, মধ্য, ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগে নারী শিক্ষার রূপ কী ছিল? কী ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার বিকাশ ঘটেছে? বর্তমান সমাজে শিক্ষিত নারীর অবস্থান কোথায়? এইসব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুপুঙ্খ তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছেন লেখক ও লেখিকারা।

অধ্যাপিকা সুব্রতা সেন ও কুমকুম রায়ের রচনায় প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কুমকুম রায় প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা

Scanned with CamScanner

সম্পর্কে আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় উন্নত, এই ধারণা অনেকাংশেই অতিরঞ্জিত। শুধুমাত্র গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো নারীর উদাহরণের ভিত্তিতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় নারীশিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। ঋকবেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সমগ্র রচনার মাত্র এক শতাংশ শাস্ত্রজ্ঞ বিদুষীদের দ্বারা রচিত। শুধু তাই নয়, সামাজিক ও ধার্মিক অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হত তার মধ্যেও তাঁদের রচিত মন্ত্রের সংখ্যা প্রায় বিরল। এছাড়া ঋকবেদে বর্ণিত সমাজ যেহেতু ছিল পশুপালক সমাজ সেখানে একটি জটিল শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ সম্ভবপর ছিল না। ফলে তাঁর মতে বৈদিক যুগকে স্ত্রীশিক্ষার স্বর্ণযুগ বলে গণ্য করা সম্ভব নয়। প্রাচীন যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপ্তি ও পরিধি সংকোচনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সুব্রতা সেনের লেখায়। কোন বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নারী তাঁর অধিকার হারিয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

মধ্যযুগে নারীর অশিক্ষা ও সামাজিক অধঃপতন একটি বহুল প্রচলিত ধারণা। কিন্তু শিরিন মুসভি দেখিয়েছেন যে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে এই মত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি দুধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। আরবি, ফারসি ভিত্তির শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রথমটির সর্বোচ্চ স্তরে নারীরা অন্তর্ভুক্ত না হলেও মক্তব শিক্ষায় মধ্যশ্রেণীর মহিলাদের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উচ্চবিত্ত শাহাজাদীদের মধ্যে শিক্ষার উদাহরণ হিসাবে তিনি গুলবদন, নূরজাহান, মমতাজ মহল প্রমুখের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও সাধারণভাবে মধ্যশ্রেণী ও উচ্চমধ্যশ্রেণীর বালিকাদের মধ্যেও শিক্ষার প্রচলন ছিল বলে তিনি মনে করেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারীশিক্ষার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরও একটি দিকে কুমকুম রায় ও শিরিন মুসভি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাচীনযুগে সংস্কৃত ভাষার মাহাত্ম্য উল্লেখ করে কুমকুম রায় দেখিয়েছেন যে, এইভাষা চর্চার মধ্যে দিয়ে, নারী ও শূদ্র সমাজে অবহেলিত দুই গোষ্ঠীকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস হয়েছিল। মূলত পুরাণের মাধ্যমেই নারী ও শূদ্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু পুরাণে দেশ ও কাল অনুযায়ী যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা কতটা নারীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল তা বলা শক্ত। ফলে প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা উচ্চাদর্শের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছিল না, তাতে জটিল শাস্ত্রচর্চার প্রয়াসও দেখা

যায়নি। কুমকুম রায়ের মতে প্রাচীন ভারতে নারীদের রচনায় লক্ষ করা যায় অকাট্য যুক্তি, অনুভব আর বাস্তব জ্ঞান। মুঘলযুগে যে সব নারী শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদেরও কবি বা চিত্রকর ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ বিশেষ ছিল না।

ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতের নারী সম্পর্কে প্রচলিত ইতিবাচক যে ধারণা ও মুঘলযুগে নারীদের সামাজিক অধঃপতনের ধারণা কোনওটাই পুরোপুরি তথ্য ভিত্তিক নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কীভাবে এই ধারণা 'প্রচলিত ধারণার' রূপ পেল? দ্বিতীয়ত দেখা যায় যে নারী শিক্ষার ব্যাপ্তি ও প্রসার যাই হোক না কেন তার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি ও উদ্দেশ্য ছিল। কিছু ব্যতিক্রমী নারী শিক্ষালাভ করলেও সমাজের উচ্চস্তরে তারা উন্নীত হতে পারেননি।

পরবর্তী রচনাগুচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনে নারীশিক্ষার গতি-প্রকৃতি উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা গেছে সমাজ সংস্কার আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ ও নারীশিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত ধারণাও সবসময় তথ্যভিত্তিক নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উন্নতি সাধনে নৈতিক দায়িত্বের কথা প্রচার করেছিল ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের চরম ঔদাসীন্য। মল্লিকা ব্যানার্জি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এই সময়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, শিক্ষা বিস্তারে খ্রিস্ট ধর্মের মহিমা প্রচার করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। যে ধরনের বই তাঁরা পড়াতেন তা থেকেও এই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলারা নানান ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতেন, বিশেষত নারী ও পুরুষের সহশিক্ষা ও সমানশিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল নানান সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উদ্দেশ্য অনেকক্ষেত্রেই উপযোগবাদী (Utilitarian) ভাবনাচিন্তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল। সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় তিনি লক্ষ করেন আদর্শ স্ত্রী, কন্যা, জায়া, জননী তৈরির প্রয়াস। এই একই প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। উনবিংশ শতকে নারীশিক্ষা সম্পর্কে বিতর্কের ঝড় ওঠে। তারই বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে নারীর আত্মপ্রকাশে সাহায্য করা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল

Scanned with CamScanner

না। নারীকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন ছিল সমাজ, পরিবার ও পুরুষের প্রয়োজনে। উত্তরা চক্রবর্তী এমনই দুই নারী— ফজিলতুন্নেসা ও আখতার ইমামের— জীবন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, যাঁরা শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেন। তাঁদের কাছে সমাজ পরিবার ও পুরুষের প্রয়োজন ছিল গৌণ। নিজেদের আত্মপ্রকাশের তাগিদই ছিল মুখ্য।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যত দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন, নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ ততই পিছনের সারিতে চলে যেতে থাকে। নারীদের রাজনৈতিক আঙিনায় নিয়ে আসার প্রয়োজনই তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে গান্ধীজির উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা অনুরাধা চন্দ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।[১] তাঁর মতে গান্ধীজির শিক্ষা সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ছিল জটিল, তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষার কথা বলেন, তাহল গৃহস্থালি শিক্ষা। গান্ধীজির মতে মেয়েদের এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কেন না মেয়েরা এই বিষয়ে পুরুষদের তুলনায় সহজাতভাবেই অনেক বেশি দক্ষ। তিনি বলেন যে মহিলাদের এই ধরনের সামাজিক ভূমিকা চিহ্নিত করার পেছনে তাঁদের খাটো করার কোনও অভিপ্রায় গান্ধীজির ছিল না। গৃহস্থালির কাজকর্মকে তিনি আদপেই গৌণ বলে মনে করতেন না। বরং নারীদের তিনি জীবনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অনুরাধা চন্দের এই বক্তব্য ইদানীং গান্ধীজির মহিলাপ্রসঙ্গ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার যে নতুন মূল্যায়ন হয়েছে তার সঙ্গে অনেকটাই সঙ্গতিপূর্ণ।[২]

স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রয়াসের কথা আলোচনা করেছেন বাণীমঞ্জরী দাশ ও শ্যামলী সরকার তাঁদের প্রবন্ধে। এই দুই লেখিকাই সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে দুই পণ্ডিতকৃত বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বাণীমঞ্জরী দাশ। কীভাবে একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সেই কাহিনীরই তথ্যনিষ্ঠ বিবরণে সমৃদ্ধ তাঁর প্রবন্ধ। বেথুন সাহেবের ব্যক্তিগত অবদান ও দূরদৃষ্টির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন শ্যামলী সরকার। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সরকারি সাহায্য ছাড়াই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেথুন সাহেবের উদ্যোগের কথা। তাঁর মতে নরম্যান বেথুন ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে

গুরুত্ব দিয়ে, শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর দায়বদ্ধতাই প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয় নিজের যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিনি স্কুলের সাহায্যার্থে দান করে যান।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে নারীশিক্ষা ও নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন রচনা চক্রবর্তী ও সুনন্দা ঘোষ। তাঁরা বর্তমান অবস্থার সাক্ষরতার হার, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে কিছুটা দেরিতে শিক্ষাবিস্তার মুসলিম নারীসমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা উপস্থাপিত হয়েছে রচনা চক্রবর্তীর লেখায়।

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গ ও তার সামাজিক অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আলোচনা থেকে একটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে যে নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির এত বছর পরেও নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। নারী আজও সমাজের অবহেলিত গোষ্ঠীর অন্যতম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পদ— এসব কিছুর ক্ষেত্রে আজও তার যাবতীয় অধিকার সর্বজনগ্রাহ্যভাবে প্রশ্নাতীত নয়। ফলে, নারীকে সমাজে সমান অধিকার ও মর্যাদা দেবার প্রচেষ্টা থেকেই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীবিদ্যাচর্চার জন্ম হয়। এক কথায় বলতে গেলে, এই বিদ্যাচর্চার বিশেষ উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সামাজিক বিশ্লেষণ নয়। কীভাবে এই বিশ্লেষণকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার করে তোলা যায় ও তার মাধ্যমে সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা যায় তার দিকনির্ণয় করাই এর আসল লক্ষ্য।

নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ আজ তাই বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। নারীকে শুধু শিক্ষিত করাই নয়, বরং যে ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারী শিক্ষিত হয়েছে সেই পরিমণ্ডলকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনই আজ বড় হয়ে উঠেছে। নারী ও তাঁর পরিমণ্ডলের মধ্যে ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে যে জটিল সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেই সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে নারীকে 'নারীত্বের' বন্ধন থেকে মুক্ত করে সমাজে পূর্ণ মানুষের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিদেই শিক্ষার পুনর্মূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। শিরিন মুসভি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গটি সর্বদাই সমাজে নারীর অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। নারী যদি বৃহত্তর জনজীবনের বাইরে থাকে তাহলে কখনোই তাঁরা জনশিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। আজ একবিংশ

Scanned with CamScanner

শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের তাই এটাই মূল উপজীব্য যে নারী কেন জনজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি? কোন প্রেক্ষাপটে 'নারী' তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় রাজনৈতিক, সামাজিক চিন্তা ও মূল্যবোধ নিয়ে একটি বিশেষ স্বতন্ত্র সত্তা হয়ে উঠেছে, তার একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই প্রয়াসের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে নারীর ভবিষ্যৎ ও নারী থেকে পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি। সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা অনেকাংশেই এই প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। নতুন গবেষণায় দেখানো হয়েছে কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের গোড়ার দিক থেকেই, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে, ঔপনিবেশিক শাসন ও ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৩] এই সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও রাজনীতি উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন ঔপনিবেশিক শাসন ও নারী প্রসঙ্গের মধ্যে জটিল সম্পর্কের কথা। ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিক থেকেই ভারতীয় নারীত্ব সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণাকে কাজে লাগানো হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বৈধতার যুক্তি খাড়া করতে। ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ায়, ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় নারীত্বের ধারণাকে দেখা হয় দুর্বল, আগাগোড়া অযৌক্তিকতায় ঘেরা ঠুনকো এক সত্তা হিসাবে। কিছুটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই ভারতীয় নারীত্বের এই ধারণাকে সেইসময় গোটা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে দুর্বল এবং সেই কারণেই শাসনযোগ্য বলে প্রমাণের চেষ্টা। পাশ্চাত্য তার স্বঘোষিত সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের জোরে, পুরুষসুলভ বলিষ্ঠতা নিয়ে তাই শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ও 'ভারতীয় নারীর' সামাজিক অবস্থানে শীর্ঘই পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে 'ভারতীয় নারী' ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু নারী যাঁরা তাদের মতে তুলনামূলকভাবে বেশি অসহায় ও সামাজিক কুসংস্কারের শিকার। মুসলিম নারী ও সমাজের প্রান্তিক নারীদের প্রসঙ্গ এঁদের চিন্তায় আসেনি।

ব্রিটিশ শাসকদের এই ধরনের চিন্তাভাবনার ফল হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের অবস্থানে উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে প্রণীত হয় একাধিক আইন— সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন, বিধবা বিবাহ প্রচলন আইন ইত্যাদি। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নারীদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনোরকম সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ভারতীয় নারীদের প্রসঙ্গে গোড়া থেকেই ব্রিটিশ সরকারের আচরণে এক ধরনের দ্বিচারিতা লক্ষ করা যায়। একদিকে তাঁরা মহিলাদের স্বার্থরক্ষার নামে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাশ করেন, অন্যদিকে একই সময় ব্রিটিশ সরকারের নতুন আইনের ফলে কেরালায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জায়গায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত রচিত হয়।[৪]

১৮৫৭র পর যখন ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতির পরিবর্তন হয় তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে কোনোরকম সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁরা আর হস্তক্ষেপ করবেন না। সংস্কারের পথ থেকে তাঁরা সরে আসেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটি রক্ষণশীল ভিত্তির ওপর স্থাপন করার প্রচেষ্টা হয়।[৫] মহিলাদের অবস্থান পরিবর্তনের বিষয়ে আর তাঁরা তেমন আগ্রহ দেখান না। ভারতীয়দের ওপরই সেই ভার অর্পণ করা হয়। দুই একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রমী আচরণ দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে Age of Consent আইন পাশের ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।[৬] এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সব আইন প্রণয়নের পেছনে ভারতীয় নারীর অবস্থার উন্নতি সাধনের অগ্রিদ যত না ছিল তার চেয়েও বেশি জরুরি ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক ভিত মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা। ফলে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থে ভারতীয় নারীদের প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ১৯২৭ সালে ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। এই বইটিকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল হিসেবেই দেখা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, এই বইটি যে শুধু সাম্রাজ্যবাদকেই সমর্থন করেছিল ও একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল তাই নয়, প্রকারান্তরে এর মধ্যে নিহিত ছিল পুরষতন্ত্রের প্রতি আক্রমণও। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু বইটির সেই দিকটি অগ্রাহ্য করেও ভারতবর্ষে পুরুষতন্ত্রের অবসান ঘটানোর চেষ্টা না করে ভারতবর্ষকে স্বশাসন না দেওয়ার যুক্তিগুলিকেই মজবুত করে।[৭] এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপজীব্য বিষয় এই যে ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিক থেকেই রাজনীতির প্রয়োজনে, ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কায়েম করতে নানাভাবে মহিলা প্রসঙ্গকে বা তাদের

Scanned with CamScanner

অবস্থাকে কাজে লাগানো হয়। সময় এবং উদ্দেশ্যভেদে বারবার শুধু কৌশলের হেরফের হয়েছে মাত্র। ক্ষমতা বিন্যাসের রাজনীতি ও মহিলা প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে এক জটিল সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীপ্রসঙ্গকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তা ভারতীয়দের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। ভারতীয় সমাজ সংস্কারকেরা ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব উভয়েই তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী নারী প্রসঙ্গকে ব্যবহার করে। একাধিক বারের টানা-পোড়েনে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পাল্টা পরীক্ষা নিরীক্ষার চাপে নারীর নিজস্ব সত্তার বিকাশ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় সমাজ সংস্কারকেরা সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য তাঁর শিক্ষার বিষয়টিকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। তাঁরা এ বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয় যে এই প্রচেষ্টার পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।[৯] পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষেরা চেয়েছিলেন তাঁদের যোগ্য সমধর্মিণী তৈরি করতে যাঁরা ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অতি সহজেই মানিয়ে নিতে পারবে। ১৮৩৮এ **সমাচার দর্পণ** পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তার একটি অংশে ঊনবিংশ শতকে নারীশিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার নিদর্শন পাওয়া যায় : "দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ওই অজ্ঞান স্ত্রীর নিকট পাইতে পারিবেন?" স্বভাবতই এই চাহিদা পূরণের জন্য নারীকে এক বিশেষ রূপে কল্পনা করা হয়। সমাজ সংস্কারকদের কল্পনার সেই নারী ছিল ধর্মীয় চেতনায় হিন্দু, শ্রেণীগত অবস্থানে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত, লিঙ্গ বৈশিষ্টে মাতৃত্বের প্রতীক ও গৃহের প্রতিমা। তাঁদের প্রচেষ্টায় তৈরি হয় বাঙালি 'ভদ্রমহিলা'। Tennyson এর **Princess** (1847) বা Ruskin-এর **Sesame and Lilies** (1865) এ নারীর যে ভাবমূর্তি রচিত হয়েছিল তারই ছায়া পড়ে নতুন আদর্শ 'ভারতীয় নারীর' সত্তায়। 'ভারতীয় নারী' একটি বিশেষ শ্রেণী, লিঙ্গ ও ধার্মিক চেতনায় মূর্ত হয়। গৃহের আঙিনাতেই তার প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা কল্পনা করা হয়, সমাজের বৃহত্তর আঙিনায় নয়। Coventry Patmore এর ভাষায় সে হয়ে ওঠে 'Apotheosis of Married love', 'The Angel in the house'। আদর্শ পুরুষকে গড়ে তোলাই তার প্রথম ও পরম

কর্তব্য বলে মনে করা হয়। শিক্ষার কর্মসূচিও তাই এমনভাবে রচিত হয় যাতে নারী গৃহবিজ্ঞান, রন্ধন, অঙ্কন, সঙ্গীত, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে এক বিশেষ নারীত্বের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে। সেই সময়ে নারী বিষয়ক যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রচলিত ছিল তার শিরোনামগুলিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য : **বামাবোধিনী পত্রিকা** (১৮৬৩) **অবলাবান্ধব** (১৮৬৯) **বঙ্গ মহিলা** (১৮৭৫) **ভারতী** (১৮৭৭) **পরিচারিকা** (১৮৭৮) **পাকপ্রণালী** (১৮৮০) **গার্হস্থ্য** (১৮৮৪) **মহিলা বান্ধব** (১৮৮৭) **দাসী** (১৮৯৭) **মহিলা** (১৮৯৭) **অন্তঃপুর** (১৮৯৮)। ফলে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট, একটি বিশেষ শ্রেণীচেতনা ও ধার্মিকবোধ নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করে।[১০] নারীকে সমাজ পরিবর্তনের একজন অংশীদার করে তোলার প্রয়াস সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় দেখা যায়নি। নারী শুরু থেকেই সংস্কারের বিষয় হয়ে ওঠে। নারীর নিজস্ব চেতনাকে উপেক্ষা করে তাঁদের সামাজিক মূল স্রোতের বাইরে রাখার ফলে তাঁরা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার এক বিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে থেকে যায়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় নারীকে রাজনৈতিক জীবনে নিয়ে আসার নানান প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু সেখানেও একই ধরনের ভারতীয় নারীর ভাবমূর্তি প্রকাশ পায়। নারীর মাতৃরূপই ফিরে আসে ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনায়। নারীকে মাতৃরূপে কল্পনা করার কারণ ব্যাখ্যা করে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চিন্তানায়কেরা জাতীয় সত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করেন : বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক।[১১] বস্তুবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা ব্রিটেনের আধিপত্য বা শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেন ও সেখানে তাঁরা ব্রিটিশদের মোকাবিলা করতে রাজি হন, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁরা ভারতীয় সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। সেই ভারতীয় সত্তা কী হবে তার রূপরেখাও তাঁরা রচনা করেন। তাঁদের কল্পিত ভারতীয় সত্তার একটি মূল উপাদান হিসেবে তৈরি হয় এক নতুন ভারতীয় নারী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের আদিপর্বেই ব্রিটিশ শক্তির মোকাবিলা করতে গড়ে ওঠে ভারতীয় নারীত্বের এক বিশেষ ধারণা। তাঁদের চিন্তায় ভারতীয় নারী হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শোষণ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, উভয়েরই মূর্ত প্রতীক। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা জোর দেন ভারতীয় নারীর সুপ্ত শক্তির ওপর। রাষ্ট্রকে তাঁরা বন্দনা করেন মাতৃরূপে যার শৃঙ্খল মোচন করাই ভারতবাসীর প্রথম রাজনৈতিক কর্তব্য বলে চিহ্নিত হয়।

Scanned with CamScanner

ফলে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ভারতের জাতীয় সত্তা ও নারীর সত্তার মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ভূমিকা সবকিছুই বাঁধা পড়ে যায় তাঁর নারীত্বের গণ্ডির মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে নারীও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায় নিজেদের মানিয়ে নেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যপর্বে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিশাল সংখ্যায় ভারতীয় নারী রাজনীতির আঙিনায় আসে। নারীকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শরিক করতে গান্ধীজি ভারতীয় নারীত্বের এক জোরদার বিকল্প ধারণা তুলে ধরেন। তাঁর কল্পনায় ভারতীয় নারী হয়ে ওঠে আত্মনির্ভর অহিংস নারীশক্তির প্রতিমূর্তি। জাতীয় ভবিষ্যৎ ও নারীর ভবিষ্যৎ আপাতদৃষ্টিতে এক হয়ে যায়। জাতীয়বাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রই তাঁদের লড়াইয়ের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেই আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যেই তাঁরা লাভ করে তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার।

কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমী নারীও ছিলেন যাঁরা এই ছকে বাঁধা গণ্ডি অতিক্রম করে স্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সমাজ সংস্কার, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন— এই সকল বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসের বাইরে তাঁরা লিপ্ত হন তাঁদের নিজস্ব লড়াইয়ে যেখানে তাঁরা লাভ করতে চান তাঁদের নিজস্ব সত্তার মুক্তি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মসচেতন নারীকে সমাজ রাষ্ট্র ও পরিবার বিরোধী বলে মনে করা হয়। বৃহত্তর সমাজচেতনার বাইরে এক বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে সে হয়ে ওঠে 'ব্যতিক্রমী'।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নারীর ভবিষ্যতের মধ্যে যে বিভেদ তা যে শুধু ব্যতিক্রমী নারীদের জীবন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রকাশ পায় তা নয়। ১৯৩৪ সালে অখিলভারত মহিলা সম্মেলন দাবি করে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের (Private Life) ক্ষেত্রে আইন পরিবর্তনের। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দিক থেকে তখন আসে চরম বিরোধিতা। জাতীয় স্বার্থ ও নারীর স্বার্থের মধ্যে চিড় ধরে। রাজনীতি, শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে নারীর অধিকার মেনে নিলেও ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবরকম পরিবর্তনকেই প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়। বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির ওপর অধিকার সবক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান আগের মতোই থেকে যায়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যে তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলা প্রসঙ্গকে ও তাদের

ভূমিকাকে কাজে লাগায় তা বোঝা যায়। পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কোনোদিনই নারীকে গৃহের গণ্ডি থেকে মুক্তি দিতে চায়নি, মাতৃত্বের ভাবমূর্তির মধ্যেই বেঁধে রাখতে চেয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে সমান অধিকারের প্রশ্ন, নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে গিয়েছে। বাইরের জগতে তাকে আনা হয়েছে জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে। কিন্তু সেই অধিকারকে সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে নারী যাতে নারীত্বের সঙ্গে জড়িত সামাজিক বিধি-নিষেধ, দায়দায়িত্ব, আরোপিত ভাবমূর্তি, অর্থনৈতিক পরাধীনতার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পায় তার প্রচেষ্টা করা হয়নি।

স্বাধীনতার পরেও নারীকে নানান অধিকার দেওয়া হয়েছে। আইনের চোখে তাকে সমান করার প্রচেষ্টা হয়েছে, তাদের আলাদা বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে দেখা হয়েছে যাতে তাদের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়। সংরক্ষণ, quota, positive discrimination, সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদির মাধ্যমে নারীকে জনজীবনের অংশ করে তোলার প্রয়াস চলেছে। কিন্তু পরিকাঠামোগত পরিবর্তন বা শিক্ষার বিস্তার কোনোটাই নারীকে সমাজে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারেনি,, কেন না ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই ক্ষমতা বিন্যাসের রাজনীতির সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থানের প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে যায়, তা সে ঔপনিবেশিক, জাতীয়তাবাদী বা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র গড়ার রাজনীতি যাই হোক না কেন। নারী politics of public space এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বৃহত্তর জনজীবনের অংশ হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে তাকে মেনে নিতে হয় সে 'নারী'। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন পুরুষের চেয়ে আলাদা, তার সামাজিক দায়দায়িত্বের চেহারা ভিন্ন। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নয়, বিবাহই তার জীবনে সামাজিক নিরাপত্তার চাবিকাঠি। বিভিন্ন সামাজিক ভূমিকার ভিত্তিতে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর শ্রম ও সময় ব্যবহৃত হবে গৃহের প্রয়োজনে। বিবাহের পর সে স্বেচ্ছায় তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক জগৎ পরিত্যাগ করবে। এই সকল শর্ত মেনে নিলে তবেই সে পাবে বৃহত্তর জনজীবনের অংশীদার হওয়ার ছাড়পত্র, ব্যক্তিগত জীবনে নারীর সমান অধিকারের প্রশ্ন আজও অবান্তর।

বাইরের জগতে সমান অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রয়োজন পরিবর্তনের ক্ষেত্র ব্যক্তিগত আঙিনায় নিয়ে আসা। নারীর প্রাপ্য অধিকারগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্ন তাই আজ

Scanned with CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীতে তাই নারীর শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান ও অধিকারের প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে পুরুষের সামাজিক ভূমিকার প্রশ্ন। এই দুইয়ের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই আসতে পারে এক নতুন সমাজ ও নতুন চেতনা, এর জন্য প্রয়োজন এমন শিক্ষাব্যবস্থা যা পুরাতনকে বর্তমান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করবে ও সমাজ পরিবর্তনের দিক নির্ণয় করবে। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারলেই শিক্ষাকে সমাজ পরিবর্তনের ও ক্ষমতায়নের একটি মূল হাতিয়ার করে তোলা সম্ভব হবে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় অবশ্য দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা এই ভূমিকা পালনে পুরোপুরি সফল হয়নি। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাই প্রশ্ন জাগে শিক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত নিয়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন শিক্ষার পনর্মূল্যায়ন, শিক্ষাকে ক্ষমতা বিন্যাসের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত করা ও এক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা যেখানে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী উপাদান থাকবে না। এই লক্ষ্যে সফল হলেই শিক্ষা শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। ইতিহাস সংসদ ও বেথুন কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাসভা ও সংকলন প্রকাশের প্রয়াস এই বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের অংশ।

সূত্রনির্দেশ

১. অনিবার্য কারণে ড: অনুরাধা চন্দের প্রবন্ধটি এই সংকলনে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

২. Sujata Patel, **'The Construction and Reconstruction of Women in Gandhi'**, **Economic and Political Weekly** (20 February 1988); Madhu Kishwar, **'Gandhi on Women'**, **Economic and Political Weekly** (5 October and 12 October 1985)

৩. A Nandy, **At the Edge of Psychology : Essays in Politics and Culture** (Delhi : 1980); M. Sinha, **Colonial Masculinity : 'The Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the late Nineteenth Century** (NY : 1995); Rosalind O' Hanlon, **'Issues of Widowhood in Colonial Western India'**, in Douglas Haynes and Gyan Prakash eds. **Contesting Power. Ressistence and Everyday Social Relations in South Asia** (Delhi 1991)

৪. M Mies, **Indian Women and Patriarchy** (Delhi : 1980)

৫. T. R. Metcalf, **The Aftermath of Revolt : India 1857 - 1870** (Princeton 1965); T. R Metcalf, **Ideologies of the Raj** The New Cambridge History of India, III. 4 (Cambridge : 1995)

৬. Late Mani, **'The Production of an official Discourse on Sati in early nineteenth century Bengal'**, **Economic and Political Weekly** (26 April 1986); **'Contentious Traditions : the Debate on Sati in Colonial India in Recasting Women : Essays in Colonial History**; Lucy Carroll, **'Law, custom and statutery social reform : The Hindu Widows' Remarriage Act of 1856** in J. Krishnamurty ed. **Women in colonial India : Essays on Survival work and the state** Delhi : 1989 ; Dagmar Engels **'The Age of Consent Act of 1891 : Colonial Ideology in Bengal'**, **South Asia Research** 3.2 1983.

৭. J. Liddle and R. Joshi, **Daughters of Independence : Gender, Caste and Class in India** (London 1986).

৮. K Sangari and S. Vaid eds. **Recasting Women : Essays in Colonial History** (New Delhi : 1989).

৯. G Murshid, **Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernisation 1849 - 1905** (Rajshahi 1983); M. Borthwick, **Changing Role of Women in Bengal 1849-1905** (Princeten 1984); হুমায়ুন আজাদ, নারী ঢাকা ১৯৯২ ; G. Forbes, Women in Modern India, The New Cambridge History of India, iv, 2. (Cambridge : 1996)

Scanned with CamScanner

১০. Sumit Sarkar, **'The Women's Question in Nineteenth Century Bengal'** in K Sangari and S. Vaid eds. **Woman and Culture** (Bombay Seccond edn. 1994)

১১. Partha Chatterji, **'The Nationalist Resolution of Women's Question'** in K. Sanguri and S. Vaid eds. **Recasting Women.** (Delhi : 1989)

Scanned with CamScanner